বিপর্যস্ত বিদ্যুৎ খাত

রাজু আহমেদ

দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা এখন বিপর্যস্ত। চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে উৎপাদন না বাড়ায় প্রতিনিয়ত সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন সংকট। এর ফলে বাড়ছে ঘাটতি, লোডশেডিং। বিদ্যুতের হঠাৎ আসা-যাওয়া যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে। বিঘ্নিত হচ্ছে কৃষি ও শিল্পের সামগ্রিক উৎপাদন এবং জরুরি নাগরিক পরিষেবা। সব মিলিয়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে তৈরি হচ্ছে প্রতিবন্ধকতা।

বিদ্যুৎ খাতের বর্তমান হালচাল

দেশে বর্তমানে বিদ্যুতের মোট গ্রাহক সংখ্যা ৭১ লাখ। এর মধ্যে গ্রামীণ এলাকায় ৪৭ লাখ এবং শহরে ২৪ লাখ। এ পর্যন্ত বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে ৪২ হাজার গ্রাম। কৃষি উৎপাদন সংশ্লিষ্ট গ্রাহক সংখ্যা ১ লাখ ৩৫ হাজার। মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩২ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করছে। দেশব্যাপী পিডিবির সরবরাহ লাইনের মোট আয়তন ২ লাখ ৯ হাজার ৯৩২ কিলোমিটার। প্রতি বছর মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ মাত্র ১৪৪ কিলোওয়াট।

দেশের প্রতিটি জনপদ বিদ্যুতের আওতায় নিয়ে আসা এবং সে অনুযায়ী উৎপাদন বৃদ্ধির দায়িত্ব মূলত বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের। তবে পিডিবি সরাসরি গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয় না। ঢাকা মহানগর এলাকায় ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (ডেসা) ও ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি (ডেসকো) এবং অন্যান্য অঞ্চলে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব পালন করে।

চাহিদা ও উৎপাদনে বাড়ছে ব্যবধান

দেশে বর্তমানে দৈনিক বিদ্যুতের চাহিদা গড়ে ৩ হাজার ৬০০ মেগাওয়াট। পিকআওয়ারে এ চাহিদা ৩ হাজার ৯০০ মেগাওয়াট। বিদ্যুৎ সুবিধার সম্প্রসারণ এবং নতুন সংযোগ বৃদ্ধির কারণে প্রতিদিনই বাড়ছে এ চাহিদা। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) তথ্য অনুযায়ী, দেশে প্রতি বছর ১০ শতাংশ বিদ্যুৎ চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চাহিদা বাড়লেও এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়ছে না উৎপাদন। এমনকি বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতাও কাজে লাগাতে পারছে না পিডিবি। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি উৎপাদন কেন্দ্র মিলিয়ে দৈনিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৪ হাজার ৭১০ মেগাওয়াট। কিন্তু নানামুখী সমস্যায় জর্জরিত উৎপাদন কেন্দ্রগুলোর পক্ষে পুরো ক্ষমতা কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে সারা দেশের বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর সর্বোচ্চ উৎপাদন ৩ হাজার ৩০০ মেগাওয়াট। গড়ে প্রতিদিন বিদ্যুতের ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৩০০ মেগাওয়াট। পিকআওয়ারে ঘাটতি রয়েছে ৬০০ মেগাওয়াট পর্যন্ত। এর সঙ্গে প্রায়শই যোগ হচ্ছে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর নানা বিপর্যয়। মাঝে মাঝেই বিকল হয়ে যাচ্ছে একেকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আবুল বারাকাতের মতে, বর্ধিত চাহিদার বিপরীতে সরকারের বর্তমান উৎপাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলেও ২০০৬ সালে দেশে বিদ্যুৎ ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ৮০০ মেগাওয়াট।

বিপর্যস্ত উৎপাদন ব্যবস্থা

দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনার কারণে প্রায় অকেজো হয়ে পড়ছে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একটির পর একটি কেন্দ্র। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) উৎপাদন কেন্দ্রের সংখ্যা ৮৫টি। এসব কেন্দ্রের বয়স সর্বনিম্ন ১০ বছর থেকে সর্বোচ্চ ৮৫ বছর। প্রয়োজনীয় সংস্কার, যথাযথ পরিচর্যা, সংরক্ষণ, আধুনিকায়নের অভাব এবং ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে জরাজীর্ণ হয়ে বন্ধ হয়ে আছে ঘোড়াশালের ২০০ মেগাওয়াট উৎপাদন কেন্দ্রসহ ১৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র। সব মিলিয়ে এগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১৫০০ মেগাওয়াট। একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিট প্রতিষ্ঠার পর এর সংরক্ষণ ও আধুনিকায়নের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেয়া হয় না। ফলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর এটি অকেজো হয়ে পড়ে। এরপরও যেগুলো চালু থাকে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সেগুলোও মাঝেমধ্যে বন্ধ হয়ে যায়।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে গ্যাস সরবরাহের অপর্যাপ্ততাও আরেকটি কারণ। দেশের অধিকাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রই গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল। এগুলোর জন্য পেট্রোবাংলা পিডিবিকে প্রতিদিন ৬১৪ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করে। প্রায়শই এ সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। গ্যাস উৎপাদন কম হলে কিংবা পাইপলাইনে সমস্যা সৃষ্টি হলে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে এর প্রতিক্রিয়া হয়।

ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে এখনই

দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে অনবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর ভিত্তি করে। মোট বিদ্যুতের ৯০ শতাংশ উৎপাদিত হয় প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে। দেশের পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলে কয়েকটি মাত্র কেন্দ্রে ফার্নেস অয়েল ও ডিজেল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ায় কয়লা খনির ওপর নির্ভর করে তৈরি হয়েছে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র। দেশের একমাত্র নবায়নযোগ্য শক্তিনির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্র কাপ্তাই। এই পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ২৩০ মেগাওয়াট।

বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশে বর্তমানে যে গ্যাস মজুদ রয়েছে তা ২০২০ সালে নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর এ আশঙ্কা বাস্তবরূপে আবির্ভূত হলে বন্ধ হয়ে যাবে অধিকাংশ বিদ্যুৎ কেন্দ্র। কর্ণফুলী নদীর পানির উচ্চতা কমে যাওয়ায় কাপ্তাই পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। ১৯৬০ সালে বাঁধ নির্মাণের পর গত ৪৫ বছরে কর্ণফুলী ও এর শাখা নদীগুলোতে

উৎপাদনের তুলনায় চাহিদা বাড়ছে

ড্রেজিং না হওয়ায় এগুলোর নাব্যতা হ্রাস পেয়েছে। এর ফলে কমে যাচ্ছে পানির উচ্চতা। এ বছর মে মাসে উচ্চতা ৭১ ফুট পর্যন্ত নেমে গেছে। রুল কার্ড অনুযায়ী এ সময় উচ্চতা থাকার কথা ৮১ ফুট। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতে, পানির উচ্চতা ৬৮ ফুটের নিচে নেমে গেলে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে। এসব আশঙ্কার কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার অধিক নিরাপদ বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। সূর্যালোক ও বায়ু ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছেন তারা।

একটি সুখস্বপ্ন এবং বাস্তবতা

সরকার ২০২০ সালের মধ্যে দেশের সর্বত্র বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এ স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে আগামী ১৫ বছরে দেশের আরো ৬৮ ভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনতে হবে। সে জন্য দেশের প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুতের নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে। ২০০৪ সালের জানুয়ারিতে প্রণীত বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের এ বিষয়ক পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২০ সালে দেশে বিদ্যুতের মোট গ্রাহক সংখ্যা হবে ২ কোটি ৪৩ লাখ। বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা দাঁড়াবে ১৪ হাজার ৬০০ মেগাওয়াট। আর সে সময় পিডিবির সরবরাহ ক্ষমতা হবে ১৭ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট। অর্থাৎ আগামী ১৫ বছরের মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে বর্তমানের প্রায় ৪ গুণ। একই সময়ের মধ্যে দেশের ৮৪ হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য লাইনের আয়তন দাঁড়াবে ৫ লাখ ১৯ হাজার ২৫৯ কিলোমিটার। আর এ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ করতে হবে প্রায় ৪৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকা।

এবং বাস্তবতা

২০২০ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার ঘোষণা হলেও এ বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণের পর গত দেড় বছরে অগ্রগতি খুবই সামান্য। এ সময়ের মধ্যে জাতীয় গ্রিডে নতুন করে যুক্ত হয়েছে মাত্র ৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। এর বাইরে সবকিছুই রয়ে গেছে শুধু কাগজে-কলমে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয় ২০০৭ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ খাতে ১৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে পেশ করে। সে অনুযায়ী প্রতি অর্থবছরে ৫ হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন। মন্ত্রণালয় মনে করে, আগামী তিন বছরে বিদ্যুতের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করতে হলে বিশাল অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। কিন্তু বিদ্যুৎ খাতে এ পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ হয়নি।

এদিকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে

সম্প্রতি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রকল্প ছাড়পত্র ও উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনসহ বিদ্যুৎ সরবরাহ এক বছরের মধ্যে শুরুর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. কামালউদ্দিন সিদ্দিকীর নেতৃত্বে গঠিত উপকমিটি শিকলবাহা, শাহজীবাজার, রাজশাহী, বগুড়া, ভোলা, সৈয়দপুর, ঠাকুরগাঁও ও বরিশালে ৮টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সুপারিশ করেছে। আর এতে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১৯ কোটি মার্কিন ডলার। কিন্তু কোথা থেকে আসবে এ বিপুল পরিমাণ অর্থ তার কোনো পরিকল্পনা এখনো করা হয়নি। প্রয়োজনীয় অর্থের্সংস্থান হলেও প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতাসহ নানা কারণে দেশে এ ধরনের প্রকল্প সম্পন্ন হতে তিন থেকে দশ বছর পর্যন্ত লেগে যায়।

তবে পিডিবি সূত্রে জানা গেছে, নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালুর মাধ্যমে দেশে আগামী এক বছরে ৬০০ মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। পুরনো বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর সংস্কারের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে আরও ২০০ মেগাওয়াট। এছাড়া ১১০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন আরও বেশ ক'টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

উন্নয়নের অন্তরায় সিস্টেম লস

বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগকৃত অর্থ সঠিকভাবে উঠে এলে দেশীয়ভাবেই চাহিদা মেটানো সম্ভব। বছরের পর বছর ধরে লোকসানের কারণে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণসহ যেকোনো উন্নয়নের জন্য পিডিবিকে মন্ত্রণালয়ের দিকে চেয়ে থাকতে হয়। সরকারি অর্থ বরাদ্দের ওপর নির্ভর করে যেকোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন। অথচ লাভজনকভাবে পরিচালিত হলে নিজেদের অর্থেই বিদ্যুৎ খাতকে অনেক দূর এগিয়ে নিতে পারে পিডিবি।

সিস্টেম লস এবং বকেয়া বিলই এ খাতে বিপুল পরিমাণ লোকসানের কারণ। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এ দুটি ক্ষেত্রে অগ্রগতির কারণে লোকসানের পরিমাণ কমেছে। বর্তমানে বিদ্যুৎ খাতে সিস্টেম লসের হার প্রায় ২৫ শতাংশ। অন্যদিকে অনাদায়ী বিলের হার ১০ শতাংশ। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির তথ্য অনুযায়ী, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ডেসা, ডেসকো এবং আরইবি'র কাছে পিডিবির মোট পাওনা বকেয়া বিলের পরিমাণ ২ হাজার ২৮৮ কোটি টাকা।

সংসদীয় স্থায়ী কমিটির এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, দীর্ঘদিন লোকসানের পর গত অর্থবছর থেকে লাভের মুখ দেখতে শুরু করেছে ডেসকো। কিন্তু বছর বছর লোকসান দিচ্ছে ডেসা। এ লোকসানের মূল কারণও সিস্টেম লস। বর্তমানে ডেসার সিস্টেম লসের পরিমাণ ১৮ থেকে ২০ শতাংশ। মাত্র কয়েক বছর আগেও এর পরিমাণ ছিল ৩০ শতাংশ।

একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা এবং গ্রাহকের অসাধুতাই ব্যাপক সিস্টেম লসের কারণ বলে জানা গেছে। গ্রাহকের কাছে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়, দুর্নীতিবাজদের কারণে তার সমপরিমাণ বিল আদায় সম্ভব হয় না। ফলে প্রতি বছরই বাড়ে লোকসানের পরিমাণ। বিপুল পরিমাণ বকেয়া বিলও বাড়াচ্ছে লোকসানের বোঝা।

এদিকে ডেসার অভ্যন্তরে প্রশাসনিক অস্বচ্ছতা ব্যাপকতা লাভ করেছে। সংসদীয় স্থায়ী কমিটির তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭১-৭২ অর্থবছর থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ডেসার মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ৫ হাজার ৭৩৮টি। এর মধ্যে মাত্র ১ হাজার ৪০৫টি এ পর্যন্ত নিষ্পত্তি হলেও বাকি ৪ হাজার ৩৩৩ টি এখনো ঝুলে আছে। এসব অডিটের সঙ্গে জড়িত রয়েছে ৫ হাজার ৪৬৯ কোটি ৬৮ লাখ টাকার হিসাব। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতে, বিদ্যুৎ খাতের দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা দূর করে সিস্টেম লস ১০ শতাংশে নামিয়ে আনতে পারলে একে লাভজনক খাতে পরিণত করা সম্ভব।

দেশের চলমান বিদ্যুৎ সংকট শিল্প ও কৃষি উৎপাদন ব্যাহত করছে। বিঘ্নিত হচ্ছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কার্যক্রম। চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং সারা দেশে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দিতে না পারলে জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ সম্ভব নয়।